শিক্ষকতাকে যিনি নিয়েছিলেন আদর্শ হিসেবে

সাহাবুল হক

হঠাৎ কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে চলে গেলেন প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান। এত তাড়াতাড়ি তিনি চলে যাবেন কেউ তা ভাবতে পারেননি। বয়স এবং শারীরিক কাঠামো বিবেচনা করলে স্বাভাবিকভাবে আরো অন্তত কুড়িটি বছর তার এ দুনিয়ায় বিচরণ করার কথা ছিল। ড. আসাদুজ্জামানের সরাসরি শিক্ষকও এখন পর্যন্ত জীবিত এবং সুস্থ। কিন্তু বিধি বাম। কখন কার ডাক আসে কেউ তা বলতে পারেন না। যেমনটি পারলেন না আমাদের প্রিয় স্যার প্রিয় মানুষ ড. আসাদুজ্জামান।

প্রায় একযুগ আগে ক্যাম্পাসে স্যারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে। তখন আমি পড়ি দ্বিতীয় বর্ষে। মাঝে মধ্যে স্যারের ফুলার রোডের বাসা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিসে যেতাম বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের কাজে কিংবা তার বক্তব্য আনার জন্য। এভাবে স্যারের সঙ্গে কম সময়ে আমার সখ্য বৃদ্ধি পায় এবং যা রচিত হয় অনেক গভীরে। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল আমার সে যোগাযোগ। স্যারের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িত।

দু'একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। ২০০৬ সালের শেষদিকে আমি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। ওখানে যোগদানের পর স্যারের সঙ্গে তার বাসায় দেখা করতে যাই। কথাবার্তা চলাকালীন এক পর্যায়ে স্যারকে জিজ্ঞাসা করি, ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য কী করতে হবে। ভেবেছিলাম স্যার আমাকে বেশি বেশি করে বই-জার্নাল পড়তে বলবেন। কিন্তু আমার সব ভাবনাকে পিছু ফেলে স্যার আমাকে যা বললেন তা হলো- 'ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রয়োজন আগে ভালো মানুষ হওয়ার।' স্যারের এ কথা শুনে কিছু আমি চমকে উঠি। মনে মনে বললাম সত্যিই তো তাই। আগে কখনোই কারো নিকট থেকে এ ধরনের কথা শুনিনি। এই হলেন আসাদুজ্জামান স্যার। ভালো মানুষের সব বৈশিষ্ট্যই ছিল তার মধ্যে বিদ্যমান। কোনো দিন কারো মনে তিনি কষ্ট দিয়েছেন।

মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় স্যারের বড় ছেলে অপু বিলাপ করে বার বার বলছিলেন 'আব্বু আমাদের কখনই কোনোদিন একটু ধমক দিয়ে কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলেননি। অপু আরো বলছিলেন, আব্বু কতটা আম্মুকে ভালোবাসতেন তা হলো আব্বুর মোবাইলে আম্মুর ছবি। আব্বুর মৃত্যুর পর মোবাইলে এটি দেখলাম।'

স্যার বাসায় যেমনটি ছিলেন তেমনটি ছিলেন বাইরেও। পোশাকে-আশাকে চলনে বলনে তিনি ছিলেন একেবারেই সাদাসিধে এবং সাধারণ একজন মানুষ। গত বছর ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন স্যার এসেছেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উঠেছিলেন অতিথি ভবনে। পরের দিন একটি শিক্ষক সিলেকশন বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ওইদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। স্যারও প্রধান অতিথি হিসেবে তাতে অংশ নেবেন। আমি এবং স্যারের প্রিয় ছাত্র আশরাফ দু'জনই স্যারের সঙ্গে ছিলাম অতিথি ভবনে। স্যার দ্রুত তৈরি হয়ে নিচ্ছেন মিলাদে যাওয়ার জন্য। এর মধ্যে আমরা দেখলাম স্যারের পরিহিত সাদা পাঞ্জাবির বোতাম নেই। এটি স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাসা থেকে আনা ছোট ব্যাগের মধ্যে বোতাম খোঁজাখুজি শুরু করলেন। না, বোতাম আর পাওয়া গেল না। আমরা স্যারকে বললাম, প্যান্ট-শার্ট পরে মসজিদে যাওয়ার জন্য। তাতে তিনি রাজি হলেন না। বোতামহীন পাঞ্জাবি নিয়েই স্যার সেদিন মিলাদ মাহফিলে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রায় ৫/৬ বছর আগের একটি ঘটনা। স্যার তখন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন। একদিন বেলা দুটোর দিকে কলা ভবনের পূর্ব পাশে আমি এবং খাদিমুল ইসলাম হৃদয় (সিনিয়র রিপোর্টার, নিউ এজ) দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। হঠাৎ দেখি আসাদ স্যারের প্রাইভেট কার। স্যার সামনের আসনে বসা। স্যারকে উদ্দেশ্য করে সালাম দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে ইশারা করে বললেন, গাড়িতে ওঠ। ব্যাস, কোনো উচ্চবাচ্য না করে সুবোধ বালকের মতো গাড়িতে উঠে বসলাম। দেখি পেছনের আসনে আরো দু'জন বসা। বয়সে তারা আমাদের চেয়ে বেশ বড়। গাদাগাদি করে চারজন গাড়ির পেছনের আসনে বসলাম। গাড়ি ক্যাম্পাসের মসজিদ গেট থেকে বের হয়ে শেরাটন হয়ে বাংলামটরের ক্রসিংয়ের বাম পাশে অর্থাৎ ভোরের কাগজের অফিসের পাশের ভবনের সামনে এসে থামল। স্যার নামলেন এবং সঙ্গে আমরাও নামলাম। স্যারকে অনুসরণ করছি। এর মধ্যে গাড়িতে বসে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্যার কোথায় যাচ্ছি। স্যার বললেন, চল কোনো খারাপ কাজে যাচ্ছি না। দেখি স্যার এখানের 'গাল্ডেন চিমনি' রেষ্টুরেন্টে প্রবেশ করছেন। এখানে বসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন কে কী খাবে। স্যারকে বেশ নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার কিছুই বুঝছি না। উত্তরে তিনি বললেন, কিছুই বোঝার দরকার নেই, খাও। তারপরে খেতে খেতে স্যার যা বললেন তা হলো-বছর খানেক আগে স্যার গিয়েছিলেন ইউরোপের কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি শিক্ষক হিসেবে, সেখানে তিনি বেশ কয়েক মাস ছিলেন। এ সময় ওই দুই যুবক স্যারকে অনেক সময় দিয়েছে, বিশেষ করে বিভিন্ন জায়গায় স্যারকে নিয়ে ঘুরিয়েছেন। তাদের বাসাতে স্যার দাওয়াতও খেয়েছেন। দেশে এসে ওই দুই যুবক স্যারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসলে স্যার তাদের নিয়ে বেরিয়েছেন খেতে। পথিমধ্যে আমাদেরও সঙ্গী করলেন।

স্যারের বাসা থেকে কেউ না খেয়ে ফেরৎ এসেছেন এবং স্যারের গাড়িতে ওঠেননি এমন ঘটনা বিরল। স্যারের বাসায় প্রায়ই আগত অতিথিদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করাতেন এবং বলতেন ‘এই মিষ্টিটা অমুক জায়গা থেকে এসেছে, বেশি করে খাও। আগে তোমাদের বয়সে আমরা কত খেয়েছি।’ স্যারের বাসায় অধিকাংশ সময়ই অতিথি থাকত। একের পর এক লোকজন আসছেন, যাচ্ছেন এবং খাচ্ছেন, স্যার কখনই বিরক্ত হতেন না। সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলতেন। স্যারের কাছ থেকে কোনো উপকার পাননি এমন লোকের সংখ্যা খুব কম।

শিক্ষকতাকে তিনি নিয়েছিলেন জীবনের আদর্শ হিসেবে। কত ঘণ্টা কত সময় স্যারের সঙ্গে কাটিয়েছি তা পরিসংখ্যনহীন। কোনো কোনো দিন রাত একটা/দু’টা পর্যন্তও স্যারের বাসায় থেকেছি। স্যার শিক্ষকদের মধ্যে কতটা জনপ্রিয় ছিলেন-এ কথা তো এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ সব সময় তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েই নির্বাচিত হতেন। তিনি ছিলেন শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সভাপতি, প্রায় দশ বছর ধরে সিন্ডিকেট সদস্য, চার চার বার সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন এবং সিনেট সদস্য। এ সব পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এক সঙ্গে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেট সদস্য। স্যার ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ধারার শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকলেও সব দলমতের শিক্ষকের তার বাসায় ছিল অবাধ যাতায়াত। স্যারের প্রশাসনিক গুণাবলীও ছিল অসাধারণ। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিসে এবং মঞ্জুরি কমিশনে দেখেছি, স্যার কীভাবে এবং কত দ্রুত ভালো ভালো সিদ্ধান্ত নিতেন এবং তা বাস্তবায়ন করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের পূর্ব পাশে নির্মাণাধীন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ১২ তলা ভবনও স্যারের একক প্রচেষ্টার ফসল। স্যার অনেক দেনদরবার করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে এ ভবনের টাকা বরাদ্দ করিয়েছিলেন।

মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনিই প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পুরোদস্তুর দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাম টেনে ধরেছিলেন এবং অত্যন্ত আপোষহীনভাবে আটটি বিশ্ববিদ্যালয় বরাদ্দের জোর সুপারিশ করেছিলেন। এতে কেউ কেউ তার প্রতি নাখোশ ছিলেন। স্যারকে বশে আনার জন্য তাকে একবার হত্যার হুমকিও দেয়া হয়েছিল। কোনোভাবেই স্যারকে দমানো যায়নি। মঞ্জুরি কমিশনে স্যারের জোরালো ভূমিকা রাখার পেছনে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হলো তার কাজ ও উদ্যোগের প্রতি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছিলো পূর্ণ আস্থা। স্যারের মঞ্জুরি কমিশনের চার বছরের দায়িত্ব পালনকালে উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে অনেক অবদান রেখেছেন। তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন, অভিন্ন

নিয়োগ নীতিমালা, অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা, উচ্চ শিক্ষার ২০ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনাসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা তৈরি করেছেন। তাঁর এ অবদানের কথা জাতি আজীবন স্মরণ রাখবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়মে তিনি যেমন ছিলেন সোচ্চার তেমনি সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও তিনি ছিলেন অনেক তৎপর। যেমন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্যারের ব্যবস্থা গ্রহণ। আবার বিসিএস পরীক্ষার কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রথম থেকেই স্যার শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জানিয়ে আসছিলেন। সব মিলিয়ে ড. আসাদুজ্জামান ছিলেন এ সময়ের একজন বিশাল হৃদয়ের সিংহ পুরুষ। যার বুকে আশ্রয় পেত সব দল, মত এবং ধর্মের মানুষ। সবার কাছে তিনি ছিলেন একজন পছন্দের এবং শ্রদ্ধার ব্যাক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আমাদের তরুণ প্রজন্মের 'আইডল'। একজন যোগ্য নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্যার আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। শুক্রবার দুপুর সোয়া বারোটার দিকে যখন আমি স্যারের এই দুঃসংবাদটি পাই তখন আমি ছিলাম সিলেটে হজরত শাহজালাল (রা.)-এর মাজারে। জুমার নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। খবরটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বাসে চড়ে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিই। বাসের ভেতরে এ সময় অর্থসহ সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলওয়াত বাজছিল।

লেখক : প্রভাষক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট